হ্যান্ডআউট

সিআইজি ও নন-সিআইজি খামারী সমাবেশ

হাঁস পালন সিআইজি

উপদেষ্টা
ডা: মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা
পরিচালক
পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সম্পাদনায়
ডা: মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন খান
ট্রেনিং এন্ড কমুউনিকেশন স্পেশালিস্ট
পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সহযোগিতায়

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) ঃ প্রাণিসম্পদ অংগ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
www.natpdls.gov.bd

হাঁস পালনের গুরুত্ব

বাংলাদেশের নদী-নালা, খালবিল, হাওড়, পুকুর, ডোবা এছাড়াও আবহাওয়া ও জলবায়ু হাঁস পালনের জন্য উপযোগী। গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে থাকে। এই কারণে একজন খামারী হাঁসকে সামান্য পরিমান খাদ্য প্রদান করে সারা বছরই লাভজনকভাবে হাঁস পালন করতে পারে।

উন্নত জাতের হাঁসের বৈশিষ্ট্য ঃ

- দেশী জাত ঃ একটি হাঁসি বছরে ৭০-৮০টি ডিম দেয় এবং উন্নত ব্যবস্থাপনায় আবদ্ধ অবস্থায় এগুলো (দেশী সাদা ও দেশী কালো) বছরে প্রায় ২০০-২০৫টি ডিম পাড়ে। প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসার ওজন ১.৭৫ - ২.৫০ কেজি এবং হাঁসীর ওজন ১.০ -১.৫০ কেজি।
- খাকি ক্যাম্পবেল ঃ একটি হাঁসি বছরে ২৫০-৩০০টি ডিম পাড়ে। প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসার ওজন ২.২৫ - ২.৫০ কেজি এবং হাঁসীর ওজন ১.২৫ -১.৫০ কেজি।
- জিংডিং ঃ একটি হাঁসি বছরে প্রায় ২৭০টি ডিম পাড়ে। প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসার ওজন ১.৭৫ - ২.০০ কেজি এবং হাঁসীর ওজন ১.২৫ -১.৫০ কেজি।
- ইন্ডিয়ান রানার ঃ একটি হাঁসি বৎসরে ২৫০-৩০০টি ডিম পাড়ে। প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসার ওজন ২.২৫ - ২.৫০ কেজি এবং হাঁসীর ওজন ১.২৫ -১.৫০ কেজি।
- পিকিং ঃ গায়ের রং সাদা, গড়ে ১৫০- ১৬০ টি ডিম দেয়, ওজন ৪ - ৪.৫ কেজি হয়ে থাকে।
- মাসকোভি ঃ মাংসের জন্য ব্যবহার করা হয়, ডিম উৎপাদন ৮০ -১০০টি, ওজন ৬ - ৭ কেজি হয়।

হাঁসের বাচ্চা প্রাপ্তির স্থান ঃ

- সরকারী পর্যায়ে কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন খামার নারায়নগঞ্জ ও আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার দৌলতপুর, নওগাঁ, সোনাগাজী, গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ থেকে বর্তমানে হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে অচিরেই হাঁস প্রজনন খামার সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারি, মাগুড়া ও হবিগঞ্জ হাঁস খামার থেকেও হাঁসের বাচ্চা পাওয়া যাবে।
- অনেকে ব্যক্তি পর্যায়ে হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করে বিক্রি করে থাকেন।

হাঁসের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা ঃ

- হাঁস খুব বেশী গরম ও খুব বেশী ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না । হাঁসের ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে বেশী খরচ না করে সীমিত খরচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ। আবার বাসস্থান নির্মাণ করতে গিয়ে এমন নড়বরে ঘর রাখা উচিৎ নয় যাতে শিয়াল, বন বিড়াল, নেউল, চিকা, ইদুর ইত্যাদি হাঁস ও হাঁসের বাচ্চার ঘরে প্রবেশ করে ক্ষতি করতে পারে।

স্থান নির্বাচন ঃ

- খোলামেলা উঁচু ও রৌদ্র থাকে এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে।
- ঘরের আশে পাশে গাছ বা জঙ্গল থাকা এবং মুরগীর খামারের পাশে থাকা ঠিক নয়।
- হাঁসের সংখ্যা এবং কি ধরণের ঘরে হাঁস পালন করা হবে তা বিবেচনা করে ঘর তৈরী করতে হবে।

ঘরের নমুনা ঃ

- অল্প হাঁসের জন্য ছোট ঘর এবং বেশী হাঁসের জন্য বড় স্থায়ী ঘর তৈরী করাই ভাল ।
- লম্বা, সরু এবং চারকোণা ঘর তৈরী করা উচিত।

- গ্রামীন পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক দুযোর্গ ও পারিপাশিক অবস্থার বিষয় চিন্তা ভাবনা করে ঘরের চালা নির্বাচন করতে হবে।

মেঝে এবং মেঝের পরিমাপ ঃ

- মেঝে অবশ্যই স্যাঁতসেঁতে মুক্ত হবে এবং কোন প্রকার গর্ত থাকবে না।
- ১-২ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার জন্য ১/২ বর্গফুট, ৩-৪ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার জন্য ১ বর্গফুট এবং ৫-৭ সপ্তাহ ও এর উপরের বয়সের হাঁসের জন্য ২ বর্গফুট জায়গার দরকার।

খাবার ও পানির পাত্র ঃ

- ঘরে পানির জন্য ওয়াটার চ্যানেল তৈরী করতে হবে যার প্রস্থ ২০ ইঞ্চি এবং গভীরতা ৮-৯ ইঞ্চি।

হাঁসের বাসস্থান ব্যবস্থাপনায় করণীয় ঃ

তাপমাত্রা ঃ

- হাঁসের জন্য খুব বেশী বা কম তাপ ক্ষতিকর,
- ঘরের তাপমাত্রা ৫৫ ডিগ্রী ফাঃ ৭৫ ডিগ্রী ফাঃ পর্যন্ত রাখাই সর্বোত্তম।

আদ্রতা ঃ

- হাঁসের ঘরের আদ্রতা ৭০% থাকাই বাঞ্চনীয়,
- অনুকূল পরিবেশ এবং আবহাওয়ায় লোম গজানো, শারীরিক বৃদ্ধি এবং ডিম উৎপাদন ভাল হয়। ঘরের আদ্রতা ৭০% এর বেশী হলে ককসিডিয়া ও কৃমি হয়।

আলো ঃ

- হাঁসের ঘরে প্রথম ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত রাতে আলোর ব্যবস্থা রাখলে হাঁসের বাচ্চা খাদ্য বেশী খাবে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাবে,
- ডিম পাড়া হাঁসের জন্য ১৪-১৬ ঘন্টা আলো থাকা দরকার। এই অতিরিক্ত আলোর জন্য বাল্বের মাধ্যমে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

বাতাস চলাচল ব্যবস্থা (ভেন্টিলেশন)ঃ

- হাঁসের ঘর শুষ্ক রাখার জন্য বাতাস চলাচল ব্যবস্থা খুবই জরুরী।
- ঘরের দেয়ালের শতকরা ৪০ ভাগ লম্বালম্বি তারের জালের বা বাঁশের সাহায্যে ছিদ্রওয়ালা বেড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা ঃ

- ব্রুডিং হচ্ছে বাচ্চাকে তাপানো। ব্রুডার হচ্ছে যেখানে বাচ্চাকে রেখে তাপানো হয়।
- ব্রুডিংকালে হাঁসের বাচ্চার মৃত্যুহার খুব বেশী হয়ে থাকে। তাই এ সময় বাচ্চার যত্নে প্রয়োজনীয় কৃত্রিম তাপ, আলো ও বায়ু চলাচল এর সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- বাচ্চা ব্রুডিং ঘরে নেয়ার ১২-১৪ ঘন্টা পূর্ব থেকেই ঘর গরম (২৮ - ৩১ সেঃ) করে রাখতে হয়। তা না হলে প্রথম কয়েকদিনের ঠান্ডা এবং কম তাপমাত্রার কারণে বাচ্চাগুলো নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হবে এবং নাভী শুকাতে দেরী হবে। অন্যদিকে তাপমাত্রার ব্যবস্থা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে বাচ্চার মৃত্যুর হার ২০ শতাংশ থেকে নেমে ৩-৪ শতাংশ চলে আসবে।
- ব্রুডারের নিচে পর্যপ্ত তাপের জন্য প্রথম সপ্তাহে ব্রুডার থেকে ৪-৫ ফুট উঁচুতে এবং ২য় সপ্তাহ থেকে ৭-৮ ফুট উঁচুতে ১০০ ওয়াটের ৪টি বাল্ব ঝুলিয়ে আলো দেয়া প্রয়োজন,
- শীতকালে সাধারণতঃ ৩-৪ সপ্তাহ এবং গরম কালে ২-৩ সপ্তাহ ব্রুডিং করতে হবে। ইলেকট্রিক বাল্ব, গ্যাস চুলা, কেরোসিনের চুলা ও বি,এল,আর,আই উদ্ভাবিত ব্রুডার দিয়ে ব্রুডিং করা যায়।

- চিক গার্ড হচ্ছে বাচ্চাকে তাপানোর জন্য ব্রুডার বক্সের চারিদিকে ঘেরাও করে দেয়া, যাতে বাচ্চা নির্দিষ্ট বেষ্টনীর বাইরে না যেতে পারে। চিক গার্ডের ভিতরে বাচ্চা ছাড়ার আগেই পানির পাত্র সরবরাহ করতে হবে,
- হাঁসের বাচ্চা ব্রুডিংকালে প্রয়োজনীয় কৃত্রিম তাপ, আলো ও বায়ু চলাচল ব্যবস্থা ঃ

বয়স (সপ্তাহ)	তাপমাত্রা (ফা)	আলো প্রদান (ঘন্টা/দিন)	বায়ু চলাচল
২	৯০	১৮	ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকলে ক্ষতিকর গ্যাস বেরিয়ে যাবে। আর্দ্রতা ঠিক থাকবে ও বাচ্চা সুস্থ্য থাকবে।
৩	৮৫	১৪	
৪	৮০	১২	
৫	৭৫	১২	
৬	৭০	১২	

হাঁসের বাচ্চা পানিতে ছাড়ার সময় ঃ

সাধারণতঃ চার সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চা পানিতে ছাড়া উচিৎ নয়। ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ঘরে প্রতিপালন করে তারপর পানিতে ছাড়ার অভ্যাস করতে হবে। পানিতে ছাড়ার সময় হলে ১ম দিনই সারা দিন পানিতে রাখা ঠিক নয়, ধীরে ধীরে পানিতে চরার অভ্যাস করতে হবে। গরমকালে দু'সপ্তাহ পরেই পানিতে ছাড়া যেতে পারে।

হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনা -

- গ্রামাঞ্চলে হাঁস অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতিতে পালন করা হয়। পুকুর খাল-বিল, নদী ইত্যাদিতে হাঁস চড়ে বেড়ায় এবং এখান থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে।
- অনেক খামারীগণ হাঁসকে শুধু ধানের কুঁড়া, চাল, গম এসব খেতে দেয়।
- সাধারণত বর্ষা মৌসুমে সম্পুরক খাদ্য হিসেবে বাচ্চা প্রতি ৫০ গ্রাম এবং বয়স্ক গুলোকে ৬০ গ্রাম হারে সুষম খাদ্য দিতে হবে।
- শুষ্ক মৌসুমে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা কমে যাবার কারণে ঐ সময় খাবার পরিমাণ (৭০-৮০ গ্রাম) বাড়িয়ে দিতে হয়। খাদ্য ব্যবস্থাপনায় এ ধরণের পরিবর্তন আনলে হাঁসের ডিম উৎপাদন বেড়ে যায়।

বয়সভিত্তিক হাঁসের সুষম খাদ্যে বিভিন্ন দানাদার খাদ্য উপাদান ও উক্ত উপাদানের মিশ্রনের পরিমান ঃ

খাদ্য উপাদান (%)	হাঁসের বাচ্চা ০-৬ সপ্তাহ	বাড়ন্ত হাঁস ৭-১৯ সপ্তাহ	ডিম পাড়া হাঁস ২০ সপ্তাহ তদুর্দ্ধ
গম ভাঙ্গা	৩৬.০০	৩৮.০০	৩৬.০০
ভুট্টা ভাঙ্গা	১৮.০০	১৮.০০	১৬.০০
চালের কুঁড়া	১৮.০০	১৭.০০	১৭.০০
সয়াবিন মিল	২২.০০	২৩.০০	২৩.০০
প্রোটিন কনসেনট্রেট	২.০০	২.০০	২.০০
ঝিনুক চূর্ণ	২.০০	২.০০	৩.৫০
ডিসিপি	১.২৫	১.২৫	০.৭৫
ভিটামিন খনিজ মিশ্রিত	০.২৫	০.২৫	০.২৫
লাইসিন	০.১০	০.১০	০.১০
মিথিওনিন	০.১০	০.১০	০.১০
লবন	০.৩০	০.৩০	০.৩০
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

হাঁসের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা -

হাঁসের দু'টি প্রধান রোগ হলো ডাক প্লেগ ও ডাক কলেরা।

ডাক প্লেগ ঃ

- হাঁসের ডাক প্লেগ জীবানু এক প্রকার ভাইরাস। এ রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে। তাই খামারে এ রোগের প্রদুর্ভাব ঘটলে দ্রুত সকল হাঁসে ডাক প্লেগ রোগ ছগিয়ে পড়ে। তাই হাঁস চাষ করতে হলে সকল হাঁসকে অবশ্যই নিয়মিতভাবে এ রোগের টিকা দিতে হবে। ডাক প্লেগ রোগে আক্রান্ত হাঁসের লক্ষন ঃ
    - আক্রান্ত হাঁস দাঁড়াতে পারে না, খুঁড়িয়ে হাঁটে এবং সাঁতার কাটতে চায়না।
    - বয়স্ক হাঁস বেশী মারা যায়।
    - রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁসের পিপাসা বেড়ে যায়।
    - হাঁস পাখা মাটিতে ঝুলিয়ে বসে থাকে।
    - হলুদ রংএর পাতলা পায়খানা হয়।
    - কখনও কখনও পায়খানার সাথে রং দেখা দেয়।
    - নাক দিয়ে পানি ঝরে।

ফাউল কলেরা বা হাঁসের কলেরা ঃ

- হাঁসের কলেরা জীবানু এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া। এই জীবানু হাঁসের দেহে প্রবেশ করে রক্তের সাথে মিশে এক প্রকার বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং রক্ত চলাচলের সাথে মিশে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত হাঁসের মল দ্বারা এ রোগ খাদ্য ও পানিকে দূষিত করে এবং খামারে ছড়িয়ে পড়ে। বাজার থেকে রোগাক্রান্ত হাঁস কিনে আনলেও এ রোগ খামারে ছড়াতে পারে। সকল বয়সের হাঁস এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কলেরা রোগে আক্রান্ত হাঁসের লক্ষণ ঃ
    - এ রোগে আক্রান্ত হাঁস খেতে চায়না।
    - পালকগুলো খসখসে হয়ে যায়, চেহারায় অবসন্নতা আসে ও রক্তশূন্য মনে হয়ে ।
    - হাঁসের পিপাসা বেড়ে যায়।
    - পায়খানার রং সবুজ এবং সাদা ও ফেনাযুক্ত মনে হয়।
    - চলাফেরা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।
    - এক জায়গায় দাড়িয়ে ঝিমাতে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে মারা যায়।

হাঁসের উপরোক্ত দু'টি রোগ ছাড়াও হাঁসের খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত কারণ যেমন, আফলাটক্সিন ও বটুলিজম এর বিষক্রিয়ায় হাঁসের মুত্যু ঘটতে দেখা যায়। তাই এ বিষয়েও আলোচনা করা যেতে পারে। আফলাটক্সিন থেকে রক্ষা করার জন্য খাদ্য তৈরী করার সময় বিশেষ করে ভুট্টাদানা খুব ভালভাবে দেখে নিতে হবে যেন ভুট্টাদানার মুখে কাল দাগ অর্থাৎ ছত্রাক না থাকে। খাদ্য উপাদানে এ ধরণের ভূট্টাদানা বাদ দিয়ে খাদ্য তৈরী করলে অন্ততঃ আফলাটক্সিন সমস্যা দূর করা যেতে পারে।

হাঁসের রোগ প্রতিকার

হাঁসের রোগ প্রতিরোধে প্রথমে আমাদেরকে রোগ বিস্তারের কারণ জানতে হবে। তা হলে হাঁসের রোগ প্রতিকার করা সহজ হবে।

রোগের বিস্তারের কারণসমূহ ঃ

- হাঁসের সুষম খাদ্যের অভাব।
- সীমাবদ্ধ স্থানে নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত হাঁসের অবস্থান।

- অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান বা পরিবেশে হাঁস পালন।
- খামারে রোগ সৃষ্টিকারী অনুজীবাণু, জীবাণু, পরজীবী, ছত্রাক, ইত্যাদির আবির্ভাব।
- খামারীদের হাঁসের রোগজীবাণু বিষয়ে অসতর্কতা, অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা।
- হাঁসকে দুষিত ও ভেজা খাদ্য সরবরাহ করা।

হাঁসের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় করণীয় ঃ

- প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় হাঁসের আচরণ পরীক্ষা করতে হবে।
- খাদ্য খাওয়া ও পানি পান করার পরিমানের উপর হাঁসের স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ভর করে।
- ঘরে হাঁসের মৃত্যু হলে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানসহ দ্রুত মৃত হাঁসের সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত রোগ যেমন আফলাটক্সিন ও বটুলিজম এর কারণে হাঁসের মৃত্যু ঘটতে দেখা যায়। এ বিষয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।
- খাদ্য তৈরীর সময় বিশেষ করে ভূট্টাবীজ খুব ভালোভাবে দেখে নিয়ে অন্যান্য খাদ্য উপাদানসহ খাদ্য তৈরী করলে এ সমস্যা এড়ানো সম্ভব।
- স্থানীয় ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শে খাদ্য বা পানির সাথে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- খামারের জৈব নিরাপত্তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

হাঁসের রোগ প্রতিরোধে করণীয় ঃ

- খামারে হাঁসের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা উত্তম।
- মনে রাখতে হবে অসুস্থ হাঁস একবার সংক্রামক রোগে অসুস্থ হলে চিকিৎসায় সেই হাঁস আর পূর্বের মত উৎপাদনশীল থাকে না।
- তাই হাঁসের রোগ প্রতিকার এর জন্য টিকা প্রদান কর্মসূচী হচ্ছে একমাত্র উত্তম উপায়।
- তবে হাঁসের ফাউল কলেরা রোগ প্রতিকারে স্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হলে এ রোগের জন্য টিকা প্রদানের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত হাঁসকে কেবল ডাক প্ল্যাগ টিকা দিলে চলে।
- গবাদি প্রাণির চিকিৎসা সেবা গ্রহনের জন্য যথাসময়ে ইউনিয়ন পরিষদে অবস্থিত FIAC এ গিয়ে সিল (CEAL) এর সহায়তা অথরা উপজেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালে গিয়ে Veterinary Doctor এর পরামর্শ নেয়ার জন্য খামারীদের উদ্বুদ্ধকরণ।
- টীকাদান কর্মসূচী নিয়মিত অনুসরণ করলে সম্পূর্ণরূপে হাঁসের উক্ত রোগের ঝুঁকি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এসব রোগের টিকাদান পরিকল্পনা ও প্রদানের নিয়মাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

হাঁসের রোগ প্রতিরোধক টীকাদান কর্মসূচী ঃ

রোগের নাম	প্রয়োগের বয়স	প্রয়োগ পদ্ধতি
ডাক প্লেগ	প্রথম মাত্রা ২১-২৮ দিন বয়সে। দ্বিতীয় মাত্রা (বুস্টার ডোজ (প্রথম মাত্রার ১৫ দিন পর অর্থাৎ ৩৬-৪৩ দিন বয়সে পরবর্তী ৪-৫ মাস পর একবার	বুকের মাংসে / প্রয়োগ বিধিমতে
ডাক কলেরা	প্রথম মাত্রা ৪৫-৬০ দিন বয়সে ২য় মাত্রা (বুস্টার ডোজ) ১ম মাত্রার ১৫ দিন পর অর্থাৎ পরবর্তী ৬০-৭৫ দিন বয়সে পরবর্তী প্রতি ৪-৫ মাস পরপর একবার।	ডানার তলদেশে পালক ও শিরাহীন স্থানে চামড়ার নীচে/ প্রয়োগ বিধিমতে।